গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৭ অক্টোবর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

প্রতিবাদের অধিকার জন্মগত, তার হরণ মেনে নেওয়া যায়না

নাগরিক কনভেনশনের ঘোষণা

কলকাতায় মিছিল ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর আহবানে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন। হলের ভিতরে স্থান না হওয়ায়, বহু মানুষকে হলের বাইরে থেকেই বক্তব্য শুনতে হয়েছে। এজন্য হলের বাইরেও মাইকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। সূচনাতেই বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কনভেনশনে উপস্থিত থাকতে না পেরে একটি লিখিত বার্তা পাঠান। কলকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরির প্রাক্তন ডাইরেক্টর, অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত জানান যে, শারীরিক কারণে তিনি আসতে পারছেন না, কিন্তু এই রায় গণতন্ত্রবিরোধী, কনভেনশনের মত ও উদ্দেশ্যের সাথে তিনি সহমত রাখেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর সাধারণ সম্পাদক তপন চক্রবর্তী এক বার্তায় বলেন, "যথার্থ কারণেই আপনাদের এই কনভেনশন। প্রতিবাদী গণকণ্ঠকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে আদালতের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠনও প্রতিবাদে সোচ্চার। স্বভাবতই আপনাদের এই কনভেনশনের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন থাকছে এবং এর সাফল্য আশা করছি।"

হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত বলেন, "আমি রাজনীতির লোক নই, কিন্তু প্রতিবাদের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। তাকে হরণ করার চেষ্টা হলে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হওয়াটা আমি মানুষ হিসাবে কর্তব্য মনে করি। আদালতের রায়টি আমি ১০ বার পড়েছি, কিন্তু কোন্ ধারা বলে মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করা হল, তা খুঁজে পাইনি। এই রায় ন্যায়ের স্বাভাবিক বিধানকেই লঙ্ঘন করেছে। বিচারপতি মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করলেন, অথচ যারা মিটিং-মিছিল করে তাদের বক্তব্যই শুনলেন না —এটা বিচাররীতির বিরোধী। নির্বাচিত সরকারেরই দায়িত্ব জনগণের অধিকার রক্ষা করার। আদালত যদি সেখানে হস্তক্ষেপ করে তবে সরকারকেই তার বিরুদ্ধে আদালতে লড়তে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা আমরা দেখছি না, বরং সরকারই চাইছে মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ হোক। ফলে, অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে হবে। পাশাপাশি তিনি আইনি পথেও লড়াইয়ের প্রস্তাব দেন।

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক তরুণ সান্যাল বলেন, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধন উৎসবে শোভাযাত্রা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মিছিল, খাদ্য আন্দোলনের মিছিল — কলকাতায় মিছিলের দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা আইনবিশেষজ্ঞ ছিলেন, কেউ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তাদের তৈরি করা সংবিধানেই মিছিল-মিটিং-এর মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে। এখানে বিচারক নিজে মামলা করলেন, তিনিই ব্যাখ্যা করলেন, বিচার করলেন ও রায়ও দিলেন। এটা কোন্ ধরনের বিচারপদ্ধতি? এখানে ১০০০/২০০০ টাকা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ হবে, মেডিক্যালে ভরতি হতে ১২/১৫ লাখ টাকা লাগবে, কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিক পরিবার নিয়ে পথে বসবে — তারা প্রতিবাদ জানাতে এলে শুনবে, মিছিল করে প্রতিবাদের অধিকারও তাদের নেই। এ কোন্ সর্বনাশা অবস্থা দেশে তৈরি করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি হার্টের অসুখের রুগী। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম, পথে গাড়ি আটকে গেল, রাস্তা বাঁশ দিয়ে ঘেরা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী — কোন না কোনও ভি আই পি যাচ্ছেন। আমার সেদিন ডাক্তারের কাছে যাওয়া হল না। কই এনিয়ে তো কোন প্রশ্ন তোলা হয় না?

দুয়ের পাতায় দেখুন

এই রায় সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী

— অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় কনভেনশনে নিম্নের বার্তাটি পাঠান)

৯-১০-০৩

শ্রী প্রভাস ঘোষ বন্ধুবরেষু,

আগামী কাল (১০ অক্টোবর) যে নাগরিক কনভেনশন আহূত হয়েছে তার আমন্ত্রণলিপি পেয়েছি। ঐ কনভেনশনে উপস্থিত থাকতে পারব না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

কনভেনশনে মূলত আলোচ্য বিষয় — অতি সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম মাননীয় বিচারপতি ছুটির দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলিতে মিটিং মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে যে রায় দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী। এই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে সহমত জানাবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, আমি যে আইন অমান্য করছি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

আমরা অবশ্যই ভুলিনি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে ছিল আইন অমান্য আন্দোলন। যাদের হাতে প্রচারের অন্য কোন সুযোগ ও অস্ত্র নেই আইন অমান্য তাদের পক্ষে একমাত্র প্রচার মাধ্যম।

এটাই স্বাভাবিক যে বিপদে পড়লে তাকে মোকাবিলা করতে যে যার ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করে। মাননীয় বিচারপতিদের ক্ষমতা রায় দেওয়া, জনসাধারণের ক্ষমতা একত্রিত হয়ে বাধাদান করা। দুয়ের মধ্যে বিরোধিতা হতে পারে এবং এই বিরোধিতাকে মেনে নেওয়াই সমীচীন। দেখতেই পাচ্ছি উক্তরূপ রায় দানের জন্যই মিটিং-মিছিলের সংখ্যা পরিকল্পিত সংখ্যার থেকে অনেক বেশিই হবে।

পূজা ইত্যাদির মত সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলিতে বাদ্যযন্ত্রাদির আওয়াজে যাতে কারো একাগ্রতায় (যেমন পরীক্ষার্থীর পড়াশুনা) ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য মাননীয় হাইকোর্ট আওয়াজের ডেসিবেল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক পরীক্ষার্থী যখন তার মাননীয় বিচারপতি পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এই নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে, তখন ঐ বাস্তবমুখী মাননীয় বিচারপতি রায় দিলেন ঃ পাঠে বসার পূর্বে দুই কানে তুলো গুঁজে দিও।

যাঁরা আইন অমান্যকে মানতে চান তাঁরাও কানে তুলো গুঁজে দিন।

কনভেনশনের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। আপনারা যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা মান্য করতে সম্পূর্ণ রাজি।

অভিনন্দন সহ

স্বাঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়

ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় তথা অন্যান্য রাজ্য সরকার যেভাবে শিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি করে চলেছে, শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করেছে, বিশেষ করে পাঠক্রমের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে — তার বিরুদ্ধে গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লিতেই অনুষ্ঠিত হল উত্তর ভারতের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর পার্লামেন্ট অভিযান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

ভারতীয় নবজাগরণের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস ২৬ সেপ্টেম্বর দিনটিকে ছাত্রবিক্ষোভের উদ্যোক্তা সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও আগেই 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। সংগঠনের আহবানে এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছিলেন দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী।

মান্ডিহাউসের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড ওমপ্রকাশ। সেখান থেকে এক দীর্ঘ সুসজ্জিত স্লোগানমুখর মিছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দিকে যেতে শুরু করে। পার্লামেন্ট স্ট্রীটে পুলিশ মিছিল আটকে দিলে সেখানেই বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপরোক্ত রাজ্যগুলির ছাত্রনেতারা ছাড়াও কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড রাম অবতার শর্মা, শ্রীরাম ও দীপক — এই তিন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি শিক্ষাকে বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত করার কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির প্রবল সমালোচনা করে বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও দলমত নির্বিশেষে যেন তেন প্রকারেণ এই একই নীতি প্রয়োগ করে চলেছে। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায় শিক্ষাজগতের এসব সঙ্কটের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করে দেখান যে, ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি, ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের সমস্যা ছাত্র সমাজের ওপর এক চরম বিপদ নামিয়ে এনেছে। তিনি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ফি-ব্যবস্থা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, এই রায় আসলে ব্যক্তিমালিকদের শিক্ষাক্ষেত্রে লগ্নির মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের রাস্তাই খুলে দিচ্ছে। শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য যে যথার্থ মানুষ তৈরি ও চরিত্র গঠন, তাই আজ দেশের শাসকশ্রেণীর প্রবল আক্রমণের শিকার। এরপর কমরেড দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে এক স্মারকলিপি জমা দেন।

সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ শামল তাঁর সভাপতির ভাষণে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকারের শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরিচালনার চূড়ান্ত বিপজ্জনক দিকটি তুলে ধরেন। তিনি ছাত্রসমাজের কাছে, বিশেষ করে উত্তর ভারতের ছাত্রদের কাছে শক্তিশালী সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এসব আক্রমণ প্রতিহত করার আহবান জানান।

বাঁকুড়া জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি আদায়

২২ সেপ্টেম্বর নানা সমস্যা নিয়ে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের সারাদিনব্যাপী বিক্ষোভ অবস্থান হয় ওন্দা এস-এস দপ্তরের সামনে। ওন্দা ইউনিটের সভাপতি মনসারাধা সিং ও সম্পাদক জয়দেব করের নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়িতে যুব অবস্থান

১৯ সেপ্টেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও-র জলপাইগুড়ি শহর ইউনিটের পক্ষ থেকে কদমতলা মোড়ে বিক্ষোভ অবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থানের দাবি ছিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ, উত্তরবঙ্গে সমস্ত বন্ধ চা-বাগান খোলা, বনসম্পদ ও কৃষিপণ্যকে ভিত্তি করে শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপন করা প্রভৃতি। উপরোক্ত দাবির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন কমরেড জীবন সরকার, বিজয় লোধ, গদাই চন্দ্র রায়, সফিজুল ইসলাম, সুব্রত বোস প্রমুখ।

২২ সেপ্টেম্বর একই দাবিতে ধাপগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে কৃষিবাগানে একটি পথসভা হয়।

নাগরিক কনভেনশনের ঘোষণা

একের পাতার পর

পরিশেষে তিনি বলেন, আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে জেলে গেছি, ৫০-এর দশকে জেল খেটেছি, এখন আবার প্রতিবাদ করে জেলে যেতে চাই। উপস্থিত নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমাদের ঘরে চোর ঢুকেছে, আপনারা জাগুন, জাগুন।'

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন টি ইউ সি সি'র নেতা সরল দেব বলেন, সভা-সমাবেশ মিছিল করে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আমাদের সংবিধানেই আছে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা হয়েছে, যা আমরা হারাতে দিতে পারি না। কিছুদিন আগে আমরা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি দিল্লিতে এক যুক্ত কনভেনশনে মিলিত হয়েছিলাম, সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের প্রতিবাদ জানাতে। সংবিধান অনুযায়ী কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের অধিকার সরকারের আছে, কিন্তু কোথাও ধর্মঘট বেআইনি বলা হয়নি। অথচ, আদালত সেই রায় দিয়ে দিল। বিশ্বায়নের প্রভাব বিচারব্যবস্থার উপর পড়ছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ক্ষেত্রেও আমরা সেটাই দেখছি। চটকল মালিকরা যখন তখন লকআউট করে দিয়ে শ্রমিকদের পথে বসাচ্ছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ১৫৪ কোটি টাকা মালিকরা চুরি করেছে। এর বিরুদ্ধে আদালত তো কিছু করে না!

তিনি বলেন, আজ গভীর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়েও, দুর্ভাগ্যের কথা, বামপন্থীরা শতধা বিভক্ত। অথচ, বর্তমান আক্রমণকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, আমি প্রস্তাব সমর্থন করছি। বিচারপতির রায়ের সঙ্গে আমি একমত নই। তবে সরকার ও বড় বড় দলের নেতারা যেসব কথা বলছেন, তার মধ্যে আন্তরিকতা নেই। সি পি এম নেতা বলেছেন, সরকারও গণতন্ত্রের একটি স্তম্ভ। আমি একথা মনে করিনা, অন্যথায় মোদি সরকারকেও 'গণতন্ত্রের স্তম্ভ' বলতে হয়। মিটিং-মিছিল করা আমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও অধিকার, তাকে আইন করে বাতিল করা চলে না।

সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন নেতা কার্তিক পাল বলেন, বামফ্রন্ট নামের একটি সরকার এ রাজ্যে ২৬ বছর থাকার পর আজ মিটিং-মিছিলের অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। হাইকোর্ট যে রায় দিল, তার জমি এ সরকারই করে দিয়েছে। কলকাতার এসপ্লানেড ইস্টে বরাবর জনসভা হয়েছে, এ সরকার সেটা বন্ধ করে দিল। বুদ্ধবাবুর সরকার পুঁজিপতিদের অনেক দাবি মানছেন, কিন্তু শ্রমিক জনতার দাবি মানেন না। ৮ অক্টোবর বামফ্রন্ট একটা কনভেনশন করেছে, আজ ১০ তারিখ এখানে একটা কনভেনশন হচ্ছে। দুইয়ের লক্ষ্য ভিন্ন। ওরা বিধিনিষেধ চায়, আমরা বিধিনিষেধ মানব না। চটকলের মালিক যখন এক শ্রমিককে হত্যা করল, চাঁদমণি চা-বাগানে যখন শ্রমিকদের হত্যা করা হল, ১৩ পার্টির মিছিলে মাধাই হালদারকে যখন পুলিশ গুলি করে মেরেছিল, তখন বিচারপতিরা গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে কেন এগিয়ে এলেন না? এই রায় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কেরালা ও তামিলনাড়ু হাইকোর্টের রায় ও সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ধারাতেই এটা এসেছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব।

অধ্যাপক আন্দোলনের নেতা জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাষ্ট্রের চরিত্র অনুযায়ী বিচারব্যবস্থার চরিত্র হয়, আইনও সেভাবেই হয়। এক সময় আমেরিকায় ক্রীতদাস রাখা হত, আইনেই এই অধিকার ছিল। এমনকি ক্রীতদাসকে ধরে এনে মালিক ফাঁসিও দিতে পারত। এর বিরুদ্ধে জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কনরা লড়াই করার পর নতুন যে ধনবাদী রাষ্ট্র এল, সেখানে ক্রীতদাস রাখাই বেআইনি হয়ে গেল। রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলের ফলে আইনও বদলে গেল। সেদিন ওয়াশিংটন-লিঙ্কনরা যে লড়াই করেছিলেন, তা কী আইন মেনে হয়েছিল? ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সূর্য সেন কী আইন মেনে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন? আইন মেনে কোনদিন কোনও মহৎ কাজ হয়নি, অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটাই মনুষ্যত্বের ধর্ম। সংবাদে দেখলাম, এস ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ এই রায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের জন্য বামফ্রন্টকে বলেছিলেন। তবু হল না। ইরাক নিয়ে তো একসাথে মিলতে অসুবিধা হয়নি, তাহলে এখন কিসের বাধা?

প্রতিবাদী উদ্যোগের পক্ষে গৌতম সেন বলেন, বছরে কটা বা মিছিল হয়? বেশি করেই ধরে নিলাম ২০টা, ছোট মিছিল ধরলাম ১০০টা। কিন্তু প্রতিদিন আমার পথ আটকে দেয় গাড়ির মিছিল। আমি সময়ে কাজে যেতে পারি না, হাসপাতালে যেতে পারি না। তাহলে ছুটির দিন বাদে অন্য দিন কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করে দিক। তা দেওয়া হচ্ছে না কেন? 'জনমত জনমত' বলে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু মানুষ আদালতের রায়কে সমর্থন করছে। কিন্তু এই জনমতকে ভিত্তি করেই আমরা আন্দোলন করব — ব্যাপারটা এমন নয়। বিজ্ঞাপন, মিডিয়ার প্রচার ইত্যাদি দ্বারা নানাভাবেই জনমতকে প্রভাবিত করা যায়। আবার প্রতিবাদ, গণআন্দোলনও জনমত তৈরি করে। যাঁরা জনমতের কথা বলছেন, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন — ধনীদের সমস্ত ফাঁকা বাড়ি গরিবরা দখল করে নেবে, ধনীদের সম্পদ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে — এ ব্যাপারে জনমত নেওয়া হোক — আপনারা রাজি তো? ১৯৮৪ সালে ব্রিটেনে কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘটের আগে মার্গারেট থ্যাচার বলেছিলেন, আগে ভোট নাও, তারপর ধর্মঘটে যাও। শ্রমিক নেতা বলেছিলেন, যে শ্রমিকরা ছাঁটাই হয়ে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছে, আর যারা ছাঁটাই না হওয়া মানুষ — এদের এক পাল্লায় বসিয়ে ভোট নেওয়া যায় না, আমরা ধর্মঘটের প্রশ্নে ভোটে যাব না।

তিনি বলেন, বিশ্বের সর্বত্র আজ মিটিং, মিছিল। সিয়াটল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সিয়াটলের মিছিলের মানুষ বলেছে 'এ কার রাস্তা? এ আমার রাস্তা!' আমরা চাই, কলকাতাও সিয়াটল হয়ে উঠুক।

এছাড়া বলশেভিক পার্টি, পি আর পি আই, এম সি পি আই, এ আই সি সি টি ইউ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চুক্তির ভিত্তিতে নয়, ৭০ হাজার শূন্যপদে পূর্ণ বেতনে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বি-পি-টি-এ'র নেতৃত্বে গত ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের আইন অমান্য। সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।

গণআন্দোলনের ওপরই এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ

নাগরিক কনভেনশনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

[১০ অক্টোবর নাগরিক কনভেনশনের সভাপতি হিসাবে কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ।

বন্ধুগণ,

যে সমস্ত দল এবং ব্যক্তি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন, তাঁদের সকলকেই এই মঞ্চে সামিল করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য আমরা এই কনভেনশনের আয়োজন করেছি। যেদিন সংবাদপত্রে রায়ের খবরটি প্রথম আসে, সেদিনই আমি নিজে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি দিল্লিতে ছিলেন। লেফট ফ্রন্টের অন্যান্য পার্টি লিডারদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম। সি পি এম রাজ্য সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন, পরদিন কলকাতায় ফিরেই, ৩০শে সেপ্টেম্বর এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য তিনি আমাদের জানাবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কথা তাঁরা জানাননি। পরে দেখলাম তাঁরা নিজেরাই একটা কনভেনশন ডেকেছেন এবং এটা বোঝা যায়, এই প্রশ্নে তাঁরা আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আসতে প্রস্তুত নন। এটাও বোঝা যায়, তাঁরা এ ব্যাপার নিয়ে সিরিয়াস মুভমেন্ট চাইছেন না। তাঁরা বাইরে বিচারপতির প্রতি কটাক্ষ করে, সেটাকেই বিতর্কের মূল ইস্যু হিসাবে দাঁড় করিয়ে রায়ের প্রশ্নকে পিছনে ঠেলে দিয়েছেন। অন্যদিকে এই রায়কেই ব্যবহার করে, কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মিটিং-মিছিলের ওপর রিজনেবল রেস্ট্রিকশনের যে প্রস্তাবটা এনেছিলেন, সেটাকেই তাঁরা কার্যকরী করতে যাচ্ছেন। আজকে একটি সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে সি পি এম রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য বেরিয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন — "রায়ে যেমন করে বলা আছে সেটা একটা গাইড লাইন। এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে এগুলি চালু করলে ক্ষতি কি? মুখ্যমন্ত্রী যেমন তিনটি স্থান মিটিং-মিছিলের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড, শহিদ মিনার ময়দান, রাণী রাসমণি রোড, এই রায়েতেও তাই আছে, যদিও সময়টা আলাদা, রাত আটটা থেকে সকাল আটটা। মিছিলের ক্ষেত্রেও এমন কিছু প্রস্তাব আছে।" ফলে এটা বোঝা যায়, একটা মাঝামাঝি রফা হবে। আগামী বিধানসভায় হয়ত একটা বিলও সরকার আনবে। বাস্তবে এই রায় সি পি এমের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এই যে দ্বিচারিতা, একদিকে সামনে খুব তর্জন-গর্জন কর্মীদের বোঝাবার জন্য, পাবলিককে বোঝাবার জন্য; অন্যদিকে এটাকেই ব্যবহার করে তাঁরা মিটিং-মিছিলের ওপর রেস্ট্রিকশন আনতে চাইছেন। আর ঠিক এই কারণেই তাঁদের, আমাদের সঙ্গে এক মঞ্চে হাজির হওয়ায় অসুবিধা ছিল, এটা বোঝা যায়।

আমরা মনে করি, একজন বিচারপতির একদিন যাতায়াতের অসুবিধা হয়েছে বলেই এসব হয়েছে — তা নয়, এটা ইন্‌সিডেন্টাল। এই ধরনের একটা রায়ের পিছনে একটা জমি তৈরি হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস, চেম্বার্স অব কমার্স দীর্ঘদিন ধরেই মিটিং-মিছিলের বিরুদ্ধে নানান বক্তব্য আনছে। 'উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে' — এই সমস্ত বক্তব্য তারা আনছে। মালিকশ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমেও প্রচুর লেখা বের হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, কেরালা হাইকোর্টের রায় — বন্‌ধকে নিষিদ্ধ করা, সুপ্রীম কোর্টের রায় — 'সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করা চলবে না, আর কলকাতার এই সাম্প্রতিক রায় — এগুলির কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পিছনে আছে একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। একদিকে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেশিবিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণী ব্যাপক লুণ্ঠন চালাচ্ছে, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, কোটি কোটি বেকার; ফি, ডোনেশান ও ক্যাপিটেশন ফি চালু করে ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করা হচ্ছে; চিকিৎসাকে ব্যয়বহুল করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বিরাট আক্রমণ হচ্ছে; গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের উপর ব্যাপক লুণ্ঠন চলছে, নয়া কৃষিনীতি চালু হতে যাচ্ছে, সরকার নানা সেস খাজনা ইত্যাদি বাড়াচ্ছে, বিদ্যুতের দাম, পরিবহণের ভাড়া বারবার বাড়ছে। অন্যদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ক্রমাগত ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হরণ করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বাধ্যতামূলক রিটায়ার করাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ পোস্ট বাতিল করছে, কন্ট্রাক্ট লেবার প্রথা চালু করছে। এসব আক্রমণ দিনের পর দিন বাড়ছে। মানুষের বিক্ষোভও প্রচণ্ড বাড়ছে, মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। এই অবস্থায় যাতে কোন গণআন্দোলন গড়ে না উঠতে পারে, প্রতিবাদ না ধ্বনিত হতে পারে তার জন্যই এই আক্রমণ। সেইজন্যই আমরা বলেছি, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগেও বহু বাধা নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আন্দোলন হয়েছে, লড়াই হয়েছে। সেদিন ব্রিটিশ সরকার চাইলেও মিটিং-মিছিলের ওপর এরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেনি। সেদিনও রাস্তায় পথচারী ছিল, গাড়িঘোড়া চলত, কিন্তু এই প্রশ্ন তখন ওঠেনি। **পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে — যখন পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলনের উত্তাল জোয়ার চলছে, রাস্তায় রাস্তায় লড়াই হয়েছে, ব্যারিকেড ফাইট হয়েছে, সেদিনও এসব প্রশ্ন এইভাবে তোলা হয়নি। কিন্তু আজকে তোলা হচ্ছে এইসব কারণের জন্যই। ফলে নিছক মিটিং-মিছিলের উপর নয়, এটা গণআন্দোলনের উপর আক্রমণ, প্রতিবাদের উপর আক্রমণ এবং একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ।**

'বন্‌ধ করা মানেই কর্মনাশা', 'শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে উৎপাদন ব্যাহত হয়', 'মিটিং-মিছিল করলে পথচারীদের অসুবিধা হয়' — এসব কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার। জনগণের স্বার্থে কোন আন্দোলন-মিছিল করলে, জনগণ সমর্থনই করে। মালিকশ্রেণী এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করছে, জোর করে রিটায়ার করাচ্ছে, ডাউনসাইজিং করে কারখানায়-অফিসে শ্রমিক কমাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ সরকারী পোস্ট অবলুপ্ত করাচ্ছে, ফলে কোটি কোটি বেকার বাড়ছে। মালিকশ্রেণী ও সরকারের এইসব সর্বনাশা নীতি কর্মনাশা নয়, কিন্তু জনগণ এসব ও অন্যান্য অত্যাচারের প্রতিবাদে বছরে ১/২ দিন বন্‌ধ করলেই ওদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম শোরগোল তোলে যে 'কর্মনাশা বন্‌ধ হচ্ছে'! এর উদ্দেশ্য কি আন্দোলন-প্রতিবাদ বন্ধ করা নয়? তেমনি মালিকরা কারখানা ক্লোজার-লকআউট-লে-অফ করলে, শ্রমিক ছাঁটাই করলে, শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি ও পিএফ চুরি করলে 'উৎপাদন ব্যাহত' হয় না, কিন্তু শ্রমিকেরা এর প্রতিবাদ করলে 'উৎপাদন ব্যাহত' হচ্ছে বলে হৈ চৈ করে। কেন? যাতে মালিকরা যতই শোষণ-অত্যাচার করুক, এমনকি বেআইনি কাজ করুক, শ্রমিকরা যাতে কিছুতেই মাথা তুলতে না পারে। এইতো আজকে আমরা বাসভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছি এসপ্ল্যানেডে। আমাদের বহু কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে, মার খেয়েছে পুলিশের হাতে। আমরা দেখেছি পাবলিক কীভাবে সাপোর্ট করেছে, পুলিশের হাত থেকে আমাদের কর্মীদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কোথাও তো কোন বিরুদ্ধতা করতে দেখিনি।

একথা সঠিক যে, সব মিটিং-মিছিল এক ধরনের বা এক চরিত্রের হয়না। উদ্যোক্তারা কী উদ্দেশ্যে মিটিং-মিছিলের আয়োজন করছে, এবং সেখানে কী ধরনের সংস্কৃতি ও শৃখংলা বহন করছে, তার ওপরই মিটিং-মিছিলের চরিত্র ও গুণাগুণ নির্ভর করে। ভোটসর্বস্ব পার্টিগুলো ক্ষমতার মদমত্ততায় অঢেল টাকা ঢেলে বড় বড় সমাবেশের জৌলুস সৃষ্টি করে। ধর্মীয় মিছিলও হয়। সবসময় সেগুলি যে শান্ত্রবিধি মেনে চলে, তা বলা চলে না। অনেকসময় এসব মিছিলে উৎকট ফিল্মি কালচারের প্রতিফলন ঘটে। রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্র-রাজ্যের ছোট-বড় মন্ত্রী, রাজ্যপালের চলাচলের পথ সুগম করা হয় যানবাহন বন্ধ রেখে। আর এক ধরনের মিটিং-মিছিল হয় জনগণের বাঁচার দাবিতে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে, মালিকশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচারের প্রতিবাদে, পুলিশি অত্যাচারের প্রতিকারে, শ্রমিক-কর্মচারী ছাত্র-যুবদের স্বার্থে। এই ধরনের মিটিং-মিছিল আমাদের দল সহ কিছু কিছু দল করে। আমাদের দলের মিটিং-মিছিল উন্নত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে, একথা রাজ্যবাসী জানেন। আমরা পথচারীদের এবং রুগীদের সুবিধা-অসুবিধাও দেখি। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠন নিছক সংকীর্ণ স্বার্থে যেসব বিশৃংখল জমায়েত ও মিছিল করে ও অসুবিধা ঘটায়, অন্যদিকে জনগণের আন্দোলনের স্বার্থে পরিচালিত যেসব মিটিং-মিছিল হয় — এই দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। এই দু'ধরনের মিটিং-মিছিল নিশ্চয়ই সমান চোখে দেখা যায়না, জনগণ তা দেখেনও না। জনগণের স্বার্থে আমরা যে মিটিং-মিছিল করি তার বিরুদ্ধতা দূরের কথা, জনগণ তা সমর্থন ও সহানুভূতির চোখে দেখেন।

> বাস্তবে এই রায় সি পি এমের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এই যে দ্বিচারিতা, একদিকে সামনে খুব তর্জন-গর্জন কর্মীদের বোঝাবার জন্য, পাবলিককে বোঝাবার জন্য; অন্যদিকে এটাকেই ব্যবহার করে তাঁরা মিটিং-মিছিলের ওপর রেস্ট্রিকশন আনতে চাইছেন।

একটা অধিকার থাকলে, কেউ যেমন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে, আবার কেউ কেউ অপব্যবহারও করতে পারে। কিন্তু অপব্যবহার হচ্ছে এই অজুহাতে সেই ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। আজ শাসক শক্তি 'জনগণের অসুবিধা হচ্ছে' এই জিগির তুলে আন্দোলনের অধিকারগুলি কেড়ে নিতে চাইছে। একথাটা জনগণকে বুঝতে হবে। কোনও মিটিং-মিছিল যদি বিশৃংখল হয়, পথচারীদের সাথে আচরণে অসংযত ও অশালীন হয়, তবে জনগণকেই সোচ্চার হয়ে সমালোচনা করে সেগুলি বন্ধ করাতে হবে। কিন্তু জনগণের আন্দোলন-প্রতিবাদ করার অধিকার হরণ করতে দেওয়া যায়না।

আমরা এই পশ্চিমবাংলায় প্রাইমারি থেকে ইংরাজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করেছি। আমাদের মিছিলে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, এঁরা পর্যন্ত সামিল হয়েছেন। ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে, নানান প্রশ্নে আমরা লড়ে যাচ্ছি, মিটিং-মিছিল করছি। জনসাধারণ আমাদের সাপোর্ট করে। জনসাধারণ মনে করে এটা তাদের লড়াই। আমরা মিছিল করলে লোকে ভালবাসা থেকে, আবেগ থেকে গ্রীষ্মকালে রাস্তায় দু-পাশে খাবার জল দেয় আমাদের কর্মীদের; পুলিশ যখন আক্রমণ করে দরজা খুলে দেয়, আশ্রয় দেয়। এটা একটা মানসিকতা, আর এক ধরনের মানসিকতা অসুবিধা থেকে কিছু কিছু মানুষের হয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে লড়াই মানেই তো অসুবিধা ভোগ করা। স্বদেশি আন্দোলনে যে বাড়ির ছেলে প্রাণ দিয়েছে সে-মায়ের কান্না ছিল না? যাঁর স্বামী জেলে গিয়েছে সেই স্ত্রীর দুঃখ ছিল না? তাঁরা তা কীভাবে নিয়েছিলেন? দেশের স্বার্থে, বৃহত্তর স্বার্থে ত্যাগ হিসাবে নিয়েছিলেন। জনগণও অসুবিধাকে চিরদিন ত্যাগ হিসাবে নিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন, বিলাতি দ্রব্য বর্জন বা ব্রিটিশ শিক্ষা বর্জন আন্দোলন যখন হয়েছিল — সেদিনও এসব প্রশ্নে বিতর্ক কিছু কিছু উঠেছিল। কিন্তু মানুষ তা কীভাবে নিয়েছেন? আজকে পাবলিক মাইণ্ডকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

বিচারবিভাগ গণতন্ত্রের স্তম্ভ, এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। অথচ আজকে গণতন্ত্র কোথায় যে তার স্তম্ভ থাকবে? গণআন্দোলনের সৌধই যেখানে চূর্ণবিচূর্ণ, ভূলুণ্ঠিত, সেখানে স্তম্ভের কিছু ভাঙা টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই। কোন্ দেশে, কোথায়, কী গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে? শুধু আমরা কমিউনিস্টরা নয়, এই গণতন্ত্রকে ধিক্কার জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর মৃত্যুর আগে শেষ ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ। কোন্ সভ্যতাকে সেদিন তিনি বলেছিলেন, অস্তমিত হয়ে গিয়েছে? জীবনের সায়াহ্নে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, প্রথম জীবনে যা আশা করেছিলেন পশ্চিমের সেই গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি সভ্যতা, গণতন্ত্র অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। এই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন — এঁরাও

চারের পাতায় দেখুন

সব ধরনের মিটিং-মিছিলকে সমান চোখে দেখা উচিত কি

তিনের পাতার পর

কমিউনিস্ট ছিলেন না — ধিক্কার জানাননি? বুর্জোয়া গণতন্ত্র ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম যুগে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল প্রগতিশীল। আজ কোথায় ইক্যুয়ালিটি, লিবার্টি, ফ্রেটার্নিটি? সে ঝাণ্ডা ছিন্নভিন্ন, পদদলিত, লুণ্ঠিত। গণতন্ত্র কথাটাই তো বহুকথিত, বহুচর্চিত, বহুধর্ষিত। এই তো গণতন্ত্রের নায়ক আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড। ইরাকে তারা কী করল? তারা কি ইরাকে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য গিয়েছে? কীভাবে তারা আক্রমণ চালাল? এই আক্রমণকে কে সমর্থন করল? আমেরিকার পার্লামেন্ট, ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতো 'গণতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠান। এই তো গণতন্ত্রের চেহারা! গণতন্ত্র আজ কোথায়? গণতন্ত্রের নাম করেই তারা গণতন্ত্রকে আঘাত করছে। হিটলার-মুসোলিনি 'গণতন্ত্র রক্ষা'র আওয়াজ তুলেই ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল। আমাদের দেশেও 'গণতন্ত্র বিপন্ন' এই ধ্বনি তুলেই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি দেশে অতীতে যতটুকু গণতন্ত্র ছিল, তাকেও মুছে দেওয়া হচ্ছে সংবিধান সংশোধনের নাম করে। এই তো বাস্তব চিত্র।

প্রশ্ন হচ্ছে, ন্যায় বড়, না আইন বড়? মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এক ঐতিহাসিক উক্তিতে বলেছিলেন, 'যা আইনসঙ্গত তা আইনসঙ্গত বলেই ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত বা মানবিক হয় না। আবার আইনের চোখে বেআইনি হলেই তা অযৌক্তিক, অন্যায়, বা অমানবিক হয়ে যায় না।' ক্ষুদিরামরা কী করেছিলেন? ভগৎ সিংরা কি করেছিলেন? সুভাষ বোসদের লড়াই কী ছিল? ব্রিটিশদের চোখে আইনসম্মত ছিল? এঁদের আমরা কোন্ চোখে দেখব? একটা আদালত কি রায় দিয়েছে, বিচারক কি বলছে — তাই সত্য হয়ে যাবে? এটা কি ব্রহ্মার শক্তি? বিচারবিভাগ কি রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়? রাষ্ট্র কি একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় অত্যাচারের হাতিয়ার নয়? কোনও রাষ্ট্র, সংবিধান ও বিচারব্যবস্থা সর্বকালের জন্য নয়। ইতিহাসের গতিপথে এসেছে আবার চলে যাবে, নতুন ব্যবস্থা আসবে। সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র, সংবিধান, জুডিসিয়ারি শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই চালিত হয়। ফলে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন ওঠে না। একদল সৎ কিন্তু বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী, বা পুঁজির দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিপথে চালিত বুদ্ধিজীবীরাই এ নিয়ে যত গোলমাল করে। অথচ অনেক ঠকে অতি দুঃখে গরিবরা কিন্তু আক্ষেপ করে বলে, 'এ দুনিয়ায় যার টাকা আছে, তারই জন্য আইন-আদালত-থানা-পুলিশ সব আছে। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই'। এটা একটা বাস্তব সত্য। যে সংবিধানের ওপর রাষ্ট্র, বিচারব্যবস্থা কাজ করে সেই সংবিধানের রচয়িতা কারা? তারা কি শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে? কোথায় আজ 'গভর্নমেণ্ট অফ দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপ্‌ল'? কোথায় তা দাঁড়িয়ে আছে? ইলেকশনের ফলাফল তো সর্বত্রই মানি পাওয়ার, আর মাস্‌ল পাওয়ার ডিসাইড করছে। এই তো বাস্তব চিত্র। বলা হচ্ছে — 'শ্রমিক ধর্মঘট হলে উৎপাদন ব্যাহত হবে', 'পুঁজি নাকি চলে যাবে'! অথচ যখন পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ার ছিল পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে, তখন এখানে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি ইণ্ডাস্ট্রি ছিল।

আজকে এ রাজ্যে কী আন্দোলনের জন্য ইণ্ডাস্ট্রি হচ্ছে না? ইণ্ডাস্ট্রি তো খোদ আমেরিকায় হচ্ছে না। গত দু'বছরে আমেরিকায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। শিল্পাঞ্চল মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা ডাকছে জাপানকে, পশ্চিম জার্মানিকে ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করার জন্য। কিন্তু তারা যাচ্ছে না। ইনভেস্টমেণ্ট কোথায় করবে? বিশ্বজুড়ে মার্কেট নেই। মার্কেট ইকনমিতে মার্কেট ক্রাইসিস। তাই পুঁজি আইড্‌ল, পুঁজি ইনভেস্ট করা যাচ্ছে না। পুঁজিবাদ শ্রমিক

বাসট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি ও মিটিং-মিছিল বন্ধে হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে ১০ অক্টোবর এস ইউ সি আই-এর ডাকে কলকাতায় লেনিন সরণীতে পথ অবরোধে পুলিশের লাঠিচার্জ।

ছাঁটাই করছে, ডাউনসাইজিং করছে। দশ হাজার শ্রমিকের জায়গায় সে দু'শো শ্রমিক দিয়ে কাজ করাবে হায়ার টেকনোলজি প্রয়োগ করে। এইভাবে তো আক্রমণ হচ্ছে। অথচ এরই মাঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা যুক্তি তুলে দিল যে, জঙ্গি আন্দোলনের জন্য পুঁজি আসছে না। মালিকশ্রেণী এগুলোর সুযোগ নিচ্ছে। ভারতবর্ষের কোন্ রাজ্য ইণ্ডাস্ট্রিতে এগিয়ে যাচ্ছে? সব রাজ্যেই তো ছাঁটাই হচ্ছে, কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। আজ বরং পশ্চিমবাংলা লক আউটে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানে। সি পি এম সরকার এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। শ্রমিক ধর্মঘটে পশ্চিমবঙ্গ আজ অনেক রাজ্যের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ বলা হচ্ছে, **'বন্‌ধ মানেই কর্মনাশা'! ২১শে আগস্ট এস ইউ সি আই-এর বাংলা বন্‌ধ-এ জনগণ এই প্রচারের জবাব দিয়েছেন। সেদিন আমরা বলেছিলাম — রাস্তার ফুটপাথে যে গরিব মানুষটি চায়ের দোকান করেন, তিনি কি ২১ তারিখ ছুটি উপভোগ করছেন? পাড়ার পানের দোকানদার কি ছুটি উপভোগ করছেন? সংবাদমাধ্যমকে আমরা বলেছিলাম — আপনারা এঁদের জিজ্ঞাসা করুন, কেন এঁরা বন্‌ধ সমর্থন করছেন।** অথচ একটা হাওয়া তোলা হচ্ছে, বন্‌ধ মানেই কর্মনাশা, মিটিং-মিছিল মানেই পাবলিকের অসুবিধা।

তাহলে ছাঁটাই হোক, ট্যাক্স বাড়ুক, ভাড়া বাড়ুক, মূল্যবৃদ্ধি ঘটুক, বিদ্যুতের দাম বাড়ুক, বেকারত্ব বাড়ুক, শিক্ষার সংকোচন হোক, স্বাস্থ্যের সুযোগ-চিকিৎসার সুযোগ সঙ্কুচিত হোক — কোন প্রতিবাদ হবে না। যেসব শোষণে-অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানুষ আন্দোলন-বিক্ষোভে রাস্তায় নামে, কোনও সরকার, কোনও কোর্ট তো সেগুলির প্রতিকারে এগিয়ে আসেনা ? কিন্তু আন্দোলন ভঙ্গ করার জন্য তারা খুবই তৎপর। **মনে রাখবেন, প্রতিবাদ-আন্দোলন না হলে অত্যাচারী আরও বেপরোয়া হয়ে যায়, আরও মারমুখী হয়ে যায়।** তারা দেখে, আর প্রতিবাদ করার কেউ নেই। তাছাড়া **প্রতিবাদ-আন্দোলন না হলে মনুষ্যত্ব থাকে না। অন্যায়-অত্যাচার দেখে যারা তা মেনে নেয় তাদের চরিত্র তৈরি হয় না, মনুষ্যত্ব জাগে না। সমাজে যুবশক্তির যে অধঃপতন ঘটছে তার অন্যতম কারণ হল অত্যাচারের প্রতিবাদ আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। আন্দোলন না থাকলে যুক্তিবাদী মনও জাগবে না, বৈজ্ঞানিক চিন্তাও জাগবে না, মৌলবাদের প্রভাব বাড়বে, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বাড়বে। পশ্চিমবাংলায় আজও এগুলির প্রভাব কম অতীত আন্দোলনের জেরে এবং আমরা খানিকটা লড়াই করছি তার জন্য।** এখনও মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবাংলাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি। কাজেই আক্রমণ বহুদিক থেকে ভয়ঙ্কর।

সেইজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি — আমরা লড়াই করব, আন্দোলন চালিয়ে যাব। কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে আমরা আসিনি। কোন জাজ নয়, জাজমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। মূল ইস্যুকে সাইডট্র্যাক করার উদ্দেশ্যে চিপ স্টাণ্টের রাজনীতির মধ্যে আমরা নেই। এটা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। আরও ডেঞ্জারাস হচ্ছে এটাকে সামনে রেখে সি পি এম গভর্নমেণ্ট যেভাবে তাদের মতলব হাসিল করতে — অর্থাৎ রিজনেবল রেস্ট্রিকশন চাপিয়ে দিতে চাইছে। মুভমেণ্টের আবার রিজনেবল রেস্ট্রিকশন কী! কোন্‌টা রিজনেবল তা কে ঠিক করবে? যে সরকারের বিরুদ্ধে আমি আন্দোলন করব সেই সরকারই ঠিক করবে কতটুকু আন্দোলন করব, আর কতটুকু করব না; কতটুকু মিটিং করব, কতটুকু মিছিল করব বা করব না! যে মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন করবে, সেই মালিক ঠিক করে দেবে কতটুকু আন্দোলন শ্রমিক করবে, কতটুকু করবে না। এই রেস্ট্রিকশন কে ঠিক করবে? সাহিত্যিক শরৎবাবু স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বলেছিলেন — 'লাটসাহেব থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই বলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এমনভাবে লিখবে, এমনভাবে বক্তৃতা দেবে যাতে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ না জন্মায়, ক্ষোভ না হয়' — এই হল রেস্ট্রিকশন। সেইরকমই কতকগুলি জিনিস সি পি এম আনছে। এটা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস।

তাই আজকে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সমস্ত স্তরের মানুষ, বুদ্ধিজীবী থেকে সকলকেই এই প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। পশ্চিমবাংলার একটা ঐতিহ্য আছে। ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে অবিভক্ত বাংলার একটা বিশেষ স্থান ছিল। এখানে রেনেসাঁসের সূর্যোদয় ঘটেছিল, এখানে স্বদেশি আন্দোলনে বিপ্লববাদ গড়ে উঠেছিল। এই শক্তিতেই পূর্ববাংলা মাথা তুলেছিল, ধর্মীয় মৌলবাদী বন্ধন ছিন্ন করেছিল স্বাধীনতার জন্য। এরাজ্যে একসময় গণআন্দোলনের জোয়ার ছিল। সেই যে ঐতিহ্য, গোটা ভারতবর্ষ আজও সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তার একটা অংশ আমরা। আজ তারই উপর এই আক্রমণ। এমনকি দেখুন, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে পর্যন্ত, যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি গণহত্যা করছে ইরাকে, যে আমেরিকা আক্রমণ চালাচ্ছে ইরাকে, সে সমস্ত দেশেও লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমেছে। আজও ওসব দেশের শাসকরা যা করতে সাহস পায়নি, আমাদের দেশে তা করা হচ্ছে। এবং তার পক্ষে কলমও চলছে, এটা আরও দুঃখজনক। যাঁরা এসব করছেন তাঁরা কার হয়ে বলছেন, কার হয়ে লিখছেন, কী লক্ষ্য নিয়ে করছেন তা পর্যন্ত ভাবছেন না। জনগণের জন্য কি তাদের খুব দুশ্চিন্তা, তার জন্য? আসলে আক্রমণটা আন্দোলনের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদের বিরুদ্ধে। এই হচ্ছে বিষয়। সেইজন্যই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার উদ্দেশ্যে এই কনভেনশন আমাদের দল আহবান করেছে। আমরা পশ্চিমবাংলার প্রান্তে প্রান্তে, এই মহানগরীর প্রান্তে প্রান্তে অসংখ্য গণকনভেনশন করব, জনসাধারণের কাছে আমাদের বক্তব্য নিয়ে যাব। আমরা এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের দিকগুলি বলব। আর আমরা নিজেরা জনগণের সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে যেমন করে লড়াই করছি তেমন করেই লড়ে যাব। আগেও আমরা জেলে যেতাম, এখনও আমরা প্রয়োজনে জেলে যাব জনগণের স্বার্থে। আমি এখানে মনীষী রমাঁ রলাঁর একটা উক্তি দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন, 'হোয়েন অর্ডার ইজ ইন্‌জাস্টিস, ডিসঅর্ডার ইজ দি বিগিনিং অব জাস্টিস'। ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।

(অন্যান্য বক্তাদের পূর্ণ ভাষণ আগামী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করা হবে)

ভারী বৃষ্টিতেই মেদিনীপুরে বন্যা দুর্গতদের পাশে এস ইউ সি আই

১৯৭৮ সাল থেকে বার বার ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী বন্যায় প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি, মর্মান্তিক মৃত্যু থেকে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার যে কোনও শিক্ষাই নেয়নি, কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে ঠকিয়েছে, সাম্প্রতিক টানা তিনদিনের স্বাভাবিক ভারী বর্ষণেই ঘটে যাওয়া বন্যা আবারও তা প্রমাণ করল। মালদহ সমেত উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চল; মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গের বহু এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চলের একটা বড় অংশ এবার বন্যায় ভেসে গিয়েছে। প্রকৃতির রোষে নয়, সরকারি অমানবিক অবহেলা ও ব্যাপক দুর্নীতিই এর কারণ। সেচ ও পূর্ত দপ্তরের অফিসার ও ঠিকাদাররা কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরেছে। খাল-বিল-নদী সংস্কারের দ্বারা নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ বিন্দুমাত্র হয়নি। ২০০০ সালের বন্যায় রাজ্য সরকার 'অস্বাভাবিক' ভারী বর্ষণের যে মিথ্যা অজুহাত দিয়েছিল, এবার সে সুযোগও নেই। বৃষ্টি যা হয়েছে, না আবহাওয়া দপ্তর না সরকার, কোন মহলই তাকে অস্বাভাবিক বর্ষণ বলেনি। তৎসত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ চাষবাস, সহায়-সম্বল, ভিটেমাটি হারিয়ে একটুকরো পলিথিন, এক মুঠো চিঁড়ে-গুড়ের আশায় শিশুসন্তান নিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। '৭৮ সালে যে সব প্রতিশ্রুতি এই সি পি এম সরকারই দিয়েছিল, অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকৃত ত্রাণ, জলযান, কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি করে উঁচু আশ্রয়স্থল ইত্যাদির ব্যবস্থা যদি সরকার করত তবে ছাব্বিশ বছর সি পি এম রাজত্বের পর স্বাভাবিক ভারী বর্ষণেই মানুষের এই অবর্ণনীয় দুর্দশা ঘটত না। শুধু তাই নয়, বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করার যে দাবি আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে তা রূপায়িত করলে শুধু যে বন্যার হাত থেকেই মানুষকে বাঁচানো যেত তাই নয়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো জেলার মানুষদের খরার দহন থেকেও বাঁচানো যেত। কিন্তু তা হল না বামফ্রন্ট তথা সি পি এমের নির্মম ঔদাসীন্যে। পুঁজিপতিদের দাবিকে মান্য করে নন-স্টপ মোটর গাড়ি চালানোর জন্য শহরে উড়ালপুল বানাতে, মিছিল-মিটিং-বিক্ষোভ আন্দোলনে লাগাম পরাতে আজ তাদের যত তৎপরতা তার একাংশ থাকলে মানুষকে এত দুর্দশায় পড়তে হত না।

সরকারি ত্রাণ প্রায় নেই। আমাদের দলের কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে নেমেছে। কিন্তু ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তুলনায় তা আর কতটুকু, দরকার আরও অনেক বেশি। তাই পাশাপাশি চলছে ত্রাণের দাবিতে আন্দোলন। এই পরিস্থিতিকে যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে মোকাবিলার দাবি জানিয়ে গত ৯ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসে এস ইউ সি আই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করা হয়েছে নিহত ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,

মালদহ ও মুর্শিদাবাদের বন্যার্তদের জন্য ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাস্তায় ত্রাণ সংগ্রহ করেন এস ইউ সি আই কর্মীরা

জলবন্দী পরিবারগুলিকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় ও উপযুক্ত ত্রাণ সরবরাহ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রিপল, ও রিলিফ দিতে হবে। কর্মহীন ক্ষেতমজুর ও দৈনিক মজুরদের কাজ পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত রিলিফ সরবরাহ করতে হবে, ভেঙে পড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণে উপযুক্ত সাহায্য দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ দ্রুত মেরামত ও জলবন্দী এলাকার জল নিকাশীর দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ মানিক মাইতি, লেখা রায় ও জ্ঞানানন্দ রায়। ১০ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ১নং ব্লক অফিসে দলের পক্ষ থেকে ত্রিপল, ত্রাণ ও জলনিকাশীর দাবিতে ২০০ মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য ভবানীপ্রসাদ দাস ও নন্দ পাত্র। এগরার দুবদা এলাকায় জলবন্দী মানুষদের মধ্যে দলের পক্ষ থেকে চাল বন্টন করা হয়। দুর্গত মানুষদের ত্রাণে ঐ গ্রামের এস ইউ সি আই কর্মীরা নিজেদের ঘর থেকে চাল-ডাল-কুমড়ো সংগ্রহ করে ও রান্না করে দুবদা দেশপ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্প থেকে ১১ অক্টোবর ৩০০ পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে। ১২ অক্টোবর পৌরবাসীদের কাছ থেকে ত্রাণসংগ্রহ

ছয়ের পাতায় দেখুন

উৎসব শেষ, এবার একটু ফিরে দেখা দরকার

শারদীয়া উৎসবই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সবচেয়ে বড় বার্ষিক উৎসব। সকল স্তরের মানুষই এই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন। একে কেন্দ্র করেই নতুন পোষাক পরার বহুকালের রীতি। সেজন্য দোকানে দোকানে ক্রেতা মানুষের ভিড় প্রতি বছরের পরিচিত দৃশ্য। তারপর বিশেষ ৩/৪টি দিনে-রাতে রাস্তায় রাস্তায়, মণ্ডপে মণ্ডপে আলোর রোশনাই, হাজারে লাখে মানুষের পথে নামা। সংবাদমাধ্যমগুলিতেও আলোক-সজ্জার, মঞ্চ সজ্জার বিবরণ। বিশেষ বিশেষ মণ্ডপের পুংখানুপুংখ বর্ণনা। পুরস্কারের ছড়াছড়ি। যাতে মানুষের ভিড় টানা যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখন উৎসব প্রায় শেষ। এবার একটু ফিরে দেখা দরকার। সার্বজনীন অর্থাৎ সকল মানুষের এই উৎসবে সকলেই কি সামিল হতে পেরেছিল? কেন পারেনি, তার খোঁজ নেওয়ার দায় মানুষ হিসাবে আমাদের সকলেরই আছে।

এই উৎসবের সূচনা হয় নতুন পোষাক কেনার আনন্দ দিয়েই। কিন্তু ছোট ছোট হকার ও দোকানদারদের চোখে মুখে এবার খুশির চিহ্ন ছিল না, কারণ বিক্রি নেই। নামী দামী মার্কেটের বড় বড় দোকান? সেগুলিতেও এবার নাকি ভিড় যত হয়েছে, বিক্রি তত হয়নি। অর্থাৎ, ক্রেতার অভাবটাই বড় সমস্যা। এর জবাব খুঁজতে গেলেই চোখ ফেলতে হবে সমাজের সেই স্থানে, যা এতদিন হয়তো আলোর ঝলকানিতে চাপা পড়েছিল।

দু'লক্ষাধিক চটকল শ্রমিক এবার বোনাস পাননি। পুজোর দু'দিন আগে বন্ধ হয়ে গেল প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক সম্বলিত উলুবেড়িয়ার লাডলো জুট মিল। বন্ধ হয়ে রয়েছে আরও বহু জুট মিল। সরকারের বাগাড়ম্বর অনেক থাকলেও বোনাস পাননি রাজ্যের

বন্ধ চা বাগানের অসহায় শ্রমিকদের জন্য পুজোর আগে শিলিগুড়িতে অর্থসংগ্রহে নেমেছিল এস ইউ সি আই। ছবিটি ১৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের।
সৌজন্যে বর্তমান, ২০/৯/০৩

প্রাথমিক শিক্ষকরা। কিন্তু বোনাস পেয়ে গেল বাস মালিকরা। মালিক-দের ওপর চাপান কর, ফি প্রভৃতি না কমিয়ে তা উশুল করতে উৎসবের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা। হলদিয়া, দুর্গাপুর সহ শিল্পনগরী-গুলিতে একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে চলেছে। এক সময়ের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর শিল্পনগরীগুলিতে এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। একদিন যেখানে শিল্প আবাসনগুলো হাসপাতাল, স্কুল, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট নিয়ে গমগম করত, সেগুলি এখন প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছে। নির্জন বাড়ি, স্কুল। খসে খসে পড়ছে দরজা-জানালা, কার্নিসে আগাছা। একই অবস্থা ডানলপের বিশাল টাউনশিপের। ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করছে শ্রমিকরা। একদিনের ধোপদুরস্ত অফিসার আজ ধূপকাঠি ফেরি করে। সস্তায় জামাকাপড় কিনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করে কাজ হারানো শ্রমিক। এক সময়ে এলাকার তেজি বাজারগুলো আজ নিস্তেজ, দোকানগুলিও বন্ধ। উত্তরবঙ্গে একের পর এক চা বাগানে লকআউট, হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন। মালিকরা বন্ধ করেছে আলো এবং জলের সরবরাহ। শুধুমাত্র পানীয় জলের অভাবেই মারা গিয়েছে ৫০০ জন। সুদিনে যে শ্রমিক কোটি কোটি টাকা মুনাফা এনে দিয়েছে, আজ দুর্দিনে তার দিকে ফিরেও তাকায় না মালিক। অপুষ্টি, ডায়েরিয়া, আমাশয়ে মৃত্যু হয়েছে কয়েক শো মানুষের। লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা মণ্ডপের বিবরণ দিয়ে প্রতিদিন সংবাদপত্রের গণ্ডা গণ্ডা ক্রোড়পত্র বেরোলেও এগুলি কখনো খবরের কাগজে হেডিং হয় না। কখনো যদি খবর হয় তবে কাগজের এক কোণে পড়ে থাকে।

হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমানের লক্ষ লক্ষ চাষি আলুর ন্যূনতম দামটুকুও পায়নি। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে, বা সর্বস্ব বন্ধক রেখে চাষ করা চাষি গলায় ঢেলে নিচ্ছে ঘরে এনে রাখা কীটনাশকের শিশি। ঝিম মেরে যাওয়া সনাতন মণ্ডল সন্ধ্যেবেলা হতাশ গলায় জিজ্ঞাসা করে তরুণ চাষি নগেন ঘোষকে, 'হ্যাঁগো দাম কি উঠবে? কী বলে রেডিওতে?' উত্তর দেয় না নগেন ঘোষ। চাষ করে সর্বস্ব খোয়ানো চাষির মাথায় ঋণের বিপুল বোঝা।

মালদহ, মুর্শিদাবাদের হাজার হাজার পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙনে। ভাঙন এবং বন্যা মিলিয়ে বিপন্ন হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার পরিবার। খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে উপায়হীন মানুষ। সরকারি ত্রাণ অপ্রতুল। যা আছে তা নিয়েও চলছে নির্লজ্জ দলবাজি। মন্ত্রীরা কলকাতায় ঠাণ্ডা ঘরে বসে নানান রকম আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন। কেউবা আমলা, মোসাহেব, ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার নিয়ে বন্যা দেখার শোভাযাত্রা করছেন।

ছাঁটাই, লক-আউট লক্ষ মানুষের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে উৎসবকে। শহরে যখন আলোর রোশনাই, মণ্ডপে মণ্ডপে বিশ লাখি, পঞ্চাশ লাখি বাজেট, তখন এই মানুষগুলি রয়েছে অন্ধকার ঘরে মুখ বুজে। এই মানুষগুলির জীবনে নেমে আসা এই সঙ্কট শুধু তাদেরই উৎসবে সামিল হতে দেয়নি তা নয়, এই সমস্ত কলকারখানায় কাজ করা শ্রমিক, গ্রামের চাষি — এদের ওপর নির্ভর করে আরও যে লক্ষ লক্ষ মানুষের এক বিরাট বাজার বেঁচে ছিল সেগুলিও মৃতপ্রায়। যাদের কিছুটা সঙ্গতি রয়েছে, এখনও দুর্ভাগ্য জীবনকে এভাবে গ্রাস করেনি, উৎসবে যোগ দিয়েছে তারা।

কিন্তু এইভাবে যদি সমাজের বিরাট অংশের মানুষ ক্রমাগত তলিয়ে যেতে থাকেন তবে কতদিন আর জ্বলবে আলোর এ রোশনাই। তার ঝকমকানিতে কতদিন আর ঢেকে রাখা যাবে সমাজের এই মারাত্মক সংকটকে।

ভারতও অপর দেশকে ঋণ দেয় এবং সেটা নিঃশর্তে নয়

সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরাসরি দখল না করেও অন্যদেশের অর্থনীতি ও বাজারে প্রভাব বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী দেশটির একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া। এই সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কেবল বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিরই আছে — এমন ধারণাই আমাদের দেশে বহু মানুষ নিয়ে চলেন এবং এজন্য স্বভাবতই বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু দেশের অনেকেই জানে না যে, সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ছোট হিস্যাদার হিসাবে অন্যান্য দেশে একইরকম সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন চালাচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কসহ নানা আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীসংস্থার কাছে ভারত নিজে ঋণী হলেও, সেই আবার বিশ্বের প্রায় ২০টি দেশকে বছরে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার মত ঋণ দেয় এবং যথারীতি তা নিঃশর্তে নয়। ডব্লু-টি-ও চালু হওয়ার পর ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য কীভাবে অন্যান্য দেশের বাজার খুলে দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে ভারত সরকার আরও তৎপর হয়ে উঠেছে।

ভারত সরকার এ ব্যাপারে নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রথমত, কোন দেশের একটি বিশেষ প্রোজেক্টে টাকা অর্থাৎ ঋণ বা সাহায্য দেওয়ার সময় শর্ত হিসাবে সেই প্রোজেক্টের প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সবই ভারত এবং ভারতীয় প্রস্তুত-কারকদের কাছ থেকে কেনার শর্ত যুক্ত করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি নতুন সিমেন্ট কারখানার জন্য মেঘালয়ের চুনাপাথর ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে যে চুক্তি হয়েছে, তাতে ঐ প্রোজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকেই নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এমনকী ওমানের একটি সার কারখানাকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার জন্য যে চুক্তি হয়েছে তাতেও শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, অন্তত ১০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি ভারত থেকে কিনতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সেই সমস্ত দেশের বাজার ভারতীয় কোম্পানীগুলির জন্য খুলে দিতে ভারত সরকার চাপ দিচ্ছে। আফ্রিকার ছোট্ট দেশ সুরিনামকে ১০ মিলিয়ন ডলার ঋণের শর্তই হল, সে দেশের বাজার ভারতীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের জন্য খুলে দিতে হবে। ভিয়েতনামে বয়নশিল্পে আধুনিকীকরণের জন্য যে ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে তার শর্ত হল, ভারতীয় বয়নশিল্প এবং বস্ত্রশিল্প উৎপাদনকারীদের আরও বেশি করে সে-দেশের বাজারে ঢুকতে দিতে হবে।

ভারত ইরানকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে শর্ত দিয়েছে তা হল, ইরানের ছাইবার কমপ্লেক্স, ছাইবার ফাহরাজ বাস-রেলওয়ে লিঙ্ক এবং মেরিন ওয়েল ট্যাঙ্কিং টারমিনাল তৈরির বরাত ভারতকে দিতে হবে। সাথে সাথে, ভারত থেকে আরও বেশি করে অটোমোবাইল সরঞ্জাম, ওষুধপত্র লৌহ-খনিজ, চাল, চিনি, ভোজ্যতেল, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, বিশেষত টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি আমদানি করার শর্ত দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের দেশগুলি নিয়ে গঠিত সি আই এস দেশগুলিতে চা প্রভৃতি ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানী যাতে ইরানের মধ্য দিয়ে হতে পারে সেজন্য সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, ঋণ বা সাহায্যের সঙ্গে শর্ত জুড়ে ভারত সরকার অন্য দেশের বাজারে ঢোকার আগাম ব্যবস্থা করছে, অর্থাৎ নতুন করে কোন পণ্য যখন আমদানী করা হবে তা যেন ভারত থেকেই করা হয়। ভিয়েতনামের রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ভারতীয় পুঁজি অংশগ্রহণ করেছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস থেকে উৎপাদিত ২০টি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন সরবরাহ করে। আফগানিস্তানে ভারত সরকার এই নীতিকে আরও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করছে। আফগানিস্তানের পুনর্নির্মাণে ভারত সরকার ১০০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার শর্ত হিসাবে ১৫০টি বাস সরবরাহ করেছে।

এই দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক লেনদেনের শর্ত ছাড়াও ভারত জাতীয় নিরাপত্তার নামে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি করছে। পোল্যাণ্ডের সাথে মিলিটারি ট্রেনিং, সন্ত্রাসবাদ দমন, মিলিটারি বিজ্ঞান ও গবেষণাক্ষেত্রে সহায়তার যে চুক্তি ভারত করেছে, তার শর্ত হিসাবে এই প্রত্যর্পণ চুক্তি হয়েছে। ইরানের সাথে এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। দুবাইয়ের সাথে যে চুক্তি হয়েছে, তা নাকি হাতে হাতে কাজ দিচ্ছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুকাল পূর্বেই ভারতীয় পুঁজি যে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে, তা দেখিয়ে গেছেন। ভারতীয় পুঁজিবাদ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ছোট শরিক হিসাবে আধিপত্যবাদী নীতি নিয়ে চলছে, একথাও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এস ইউ সি আই দীর্ঘকাল আগে দেখিয়েছে। স্বাধীনতার ৫৫ বছর পর এখন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিবেশী দেশ ও বিশ্বের দুর্বলতর দেশগুলির উপর কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য চাপাতে চাইছে, ঋণের শর্তগুলি থেকেই তা প্রমাণিত। অথচ সি পি এম, সি পি আই এই কঠিন বাস্তবকে কার্যত অস্বীকার করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় পুঁজিবাদের মধ্যে তারা এখনও প্রগতিশীলতা খুঁজে পাচ্ছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল অংশকে সাথে নিয়ে জনগণতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান তুলে জনগণকে প্রকৃত বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুঁজিবাদকেই রক্ষা করছে। তাই দেখা যায়, বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে ভারতের নানা চুক্তির শর্ত নিয়ে নানা সময় সোচ্চার হলেও, তারা কিন্তু ভারত রাষ্ট্রটির এই সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা সম্পর্কে নীরব।

বন্যায় রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি

পাঁচের পাতার পর

করে চিঁড়া-গুড়-বিস্কুট ইত্যাদি পশ্চিম দুবদার দণ্ডপদা নার্সারি স্কুলে ক্যাম্প বসিয়ে ৩০০ পরিবারের সকল সদস্যের তালিকা করে তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে। ১৩ অক্টোবর দক্ষিণ দুবদা ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রাণশিবির থেকে ২০০ পরিবারকে চিঁড়া-গুড় বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরেও বহু ব্লক প্লাবিত হয়েছে। ৯ অক্টোবর দলের মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড পঞ্চানন প্রধান এবং কমরেড অমল মাইতি জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। জেলা রিলিফ দপ্তরের অফিসারের সঙ্গে বৈঠক করে কোন্ ব্লকে কত ত্রিপল, কতটা শুকনো খাদ্য যাচ্ছে তার তালিকা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি ব্যবস্থা যে পরিহাস ছাড়া কিছু নয় তা দেখিয়ে অবিলম্বে উপযুক্ত পরিমাণে ত্রাণ বরাদ্দের দাবি জানান। এর পরে ত্রাণ কাজে সামান্য কিছু গতি বাড়লেও বন্যাক্লিষ্ট মানুষের দুর্দশা বাস্তবে এখনও চরমে।

উল্লেখ্য যে, ২/৩ দিনের এই বর্ষায় জেলার বিরাট এলাকা জুড়ে এত বড় ক্ষতি হল সরকারি গাফিলতিতে নদীসংস্কার ও জলনিকাশীর ব্যবস্থা না হওয়ায়। '৭৮ এবং '৮৬ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বিপদগ্রস্ত এলাকাবাসী গণকমিটি গড়ে তুলে দাবি জানিয়ে আসছিল কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাগুই, চণ্ডী ইত্যাদি নদী ও তার শাখাগুলি সংস্কারের। ব্লকে, মহকুমায়, জেলায়, এমনকি বন্যাক্লিষ্ট মানুষেরা কলকাতায় পর্যন্ত হাজারে হাজারে গিয়েছে। মন্ত্রীর সঙ্গে দফায় দফায় সাক্ষাৎকার হয়েছে। লাগাতার আন্দোলনের চাপে '৯৪ সালে রাজ্য সরকার দাবি মেনে নিয়ে ৩৩ কোটি টাকার একটি স্কিম তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠায় অনুমোদনের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয়ের সম আর্থিক দায়িত্বে এই পরিকল্পনা কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আজও কার্যকর হয়নি। পরিকল্পনার বাইরে মাঝে মাঝে ২/৪ কোটি টাকা খরচ তারা করে, কিন্তু কন্ট্রাক্টর-অফিসারদের সম্পদ বৃদ্ধি ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণে তা বিন্দুমাত্র কাজে আসেনি। ঘাটালের ক্ষেত্রেও শিলাবতী নদী ও কয়েকটি খাল সংস্কারের এবং জলনিকাশীর দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলন সত্ত্বেও কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার এখানে ওখানে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে, যার বেশির ভাগটা লুট হয়, আর সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগে। এবারেও ত্রাণ পর্যাপ্ত দেওয়া, বিলির ক্ষেত্রে সর্বদলীয় কমিটি করার দাবি এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে। সাথে সাথে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জেলাশাসককে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘি, মথুরাপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। নদী বাঁধগুলির সংস্কার হয় না। এলাকার একমাত্র ফসল আমন ধান বাঁচাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গ্রামের মানুষকে বাঁধ পাহারা দিতে হচ্ছে। রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অথচ সেচ দপ্তর, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর, বি ডি ও অফিস থেকে তেমন কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। কঙ্কনদীঘি অঞ্চলের প্রধান বিশাখা মণ্ডল ও উপপ্রধান মধু মণ্ডল প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যেই বি ডি ও অফিসে এসে ত্রাণের দাবি জানান। যেখানে শত শত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে মাত্র ১৫ টি ত্রিপল, অল্প কয়টি জামাকাপড় ছাড়া কিছু মেলেনি। পূর্বজটা মাঝের খেয়া ও তারক মণ্ডলের ঘেরি সহ প্রয়োজনীয় এলাকায় নদীবাঁধ মেরামতের দাবির উত্তরে বি ডি ও অর্থাভাব ও অক্ষমতার কথা জানান এবং অফিসার পাঠিয়ে কঙ্কনদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কুমড়াপাড়ার বামুনের ঘেরি ও সিংহের ঘেরি; নগেন্দ্রপুরের দমকল, দক্ষিণ কঙ্কনদীঘি, নন্দকুমারপুরের কৈলাসপুর, মহবৎনগর সহ বিশাল এলাকা জুড়ে নদীবাঁধ জীর্ণ, অনেক স্থানে ফাটল দেখা দিচ্ছে।

সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার রায়দীঘির ইরিগেশন ও এস ডি ও দপ্তর, হাসপাতাল, বাজার সবই জলের তলায়। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি নিয়মিত আসেন যে রায়দীঘি মার্কেটে, সেখানে জল নিকাশি ড্রেন ও স্লুইস গেট তৈরি করা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে। সেখান দিয়ে বন্যার মতো নদীর নোনা জল ঢুকছে। গেট মেরামত কেউই করছে না। পি ডব্লু ডি কিছু ড্রেন করেছে যেগুলি কেবল মশা মাছির জন্ম দিচ্ছে ও পরিবেশ দূষিত করছে। মন্ত্রী মশাই গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন, চলে যান; অথচ দুর্গত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ নেই। সরকারি ছিঁটেফোঁটা সাহায্য যা পাওয়া যাচ্ছে ও যাবে, তাতে ব্যাপক দলবাজী হচ্ছে এবং হবে বলে মনে করছে স্থানীয় মানুষ। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে এসবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং সর্বত্র ত্রাণের দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

লালবাগে বন্যাভাঙন প্রতিরোধ কমিটির অবস্থান

বন্যা ভাঙনের স্থায়ী সমাধান, ভাঙন দুর্গতদের পুনর্বাসন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আগামী তিনমাস বিনামূল্যে রেশন, বন্যা কবলিত এলাকার জমির খাজনা ও কৃষি ঋণ মকুব, বন্যার্তদের চিকিৎসা, আন্দোলনের কর্মীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর লালবাগ মহকুমা অফিসের সামনে গণঅবস্থান হয়। মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন সাধন রায়, সাজেম আলি, আবুল কালাম আজাদ, সাইদুল ইসলাম ও চাঁদ মহম্মদ।

নদীয়া জেলা জুড়ে পাটচাষীদের বিক্ষোভ

২৯ সেপ্টেম্বর এ আই কে কে এম এস নদীয়া জেলা কমিটির ডাকে বেথুয়াডহরীতে জে সি আই-এর আঞ্চলিক ম্যানেজারের কাছে চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্য দামে সরকার কর্তৃক পাট কেনা ও দুর্নীতিরোধের দাবিতে পাটচাষীরা গণডেপুটেশনে সামিল হয়।

উল্লেখ্য, ১৬ সেপ্টেম্বর কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে করিমপুর, নাজিরপুর ও দেবগ্রামের ক্রয় কেন্দ্রগুলিতেও বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ইসলাম বা কোন ধর্মই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয় না

(উর্দু পত্রিকা 'গাজি-ই-মিলাত'-এর পক্ষ থেকে গত ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল "ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় ও সন্ত্রাসবাদ"। ঐ সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন, সেটি প্রকাশ করা হল।)

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

আমি বুঝতে পারছি, যেহেতু আমাদের দেশে ও বিদেশে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করে যাচ্ছে 'মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদী', 'ইসলাম সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়', — সেইজন্য আজকের এই সেমিনারের বিষয় রাখা হয়েছে, 'ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্ অ্যাণ্ড টেররিজম্'। আমাদের দল মনে করে, ইসলাম বা কোন ধর্মই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয় না, দিতে পারে না। আমি নিজে মার্কসবাদী। আমরা যদিও ধর্মে বিশ্বাস করিনা, তবুও অতীত যুগের সকল ধর্মীয় প্রচারকদের আমরা অতি মহান চরিত্র বলে শ্রদ্ধা করি। আমরা মনে করি, সকল ধর্মই উৎপত্তির সময় সেই সেই দেশে মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সে যুগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল কিন্তু কালের নিয়মে আজ ধর্মের সেই ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসলাম বা কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোন অসত্য প্রচারকে আমরা সমর্থন করি না। ইসলাম কথাটির অর্থই হচ্ছে শান্তি। সে যুগে চরম সঙ্কটগ্রস্ত অশান্ত আরবে শান্তির আহবান নিয়ে এই ধর্ম এসেছিল এবং তা অনেক মহান ভূমিকা পালন করে গিয়েছে।

আজ ইসলামের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার কারা করছে? করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাগরেদরা। কেন করছে? কারণ, মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই যে ইরাক আক্রমণ করে দখল করল, তারও আগে আফগানিস্থানে হামলা চালালো এবং দীর্ঘদিন ধরে ইজরায়েলকে দিয়ে প্যালেস্তানিয়দের উপর যে আক্রমণ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণ, বিশ্বের জনগণ। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই যে এই আক্রমণগুলি চালাচ্ছে, এই সত্যকে শাসকরা চাপা দিতে চায়; বোঝাতে চায়, এটা হচ্ছে 'পশ্চিমী সভ্যতা' ও 'ইসলামী সভ্যতা'র লড়াই। এইভাবে সে সুকৌশলে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রিশ্চিয়ান সেন্টিমেণ্টকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, যদিও আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণ এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হননি। লক্ষ লক্ষ মানুষ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত স্তর। যুদ্ধ, পররাজ্য দখল, ধ্বংস, কাঁচামাল লুণ্ঠন, শ্রমশক্তিকে শোষণ — এইসব ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বাঁচতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের কোন ধর্ম নেই। লুণ্ঠন ও শোষণই তার ধর্ম। সাম্রাজ্যবাদের সাগরেদ ও দালালদেরও একই চরিত্র। তাই দেখা যায়, মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও সৌদি আরব, জর্ডন, কুয়েত ও মিশরের শাসকশ্রেণী ইরাক আক্রমণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের মদত দিয়ে গেছে।

আমাদের দেশেও হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমবিদ্বেষী মানসিকতা জাগাবার জন্য এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদেরও চরিত্র নানাধরণের। আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকুল্লা খান, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা, যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও অসীম সাহস ও বীরত্ব নিয়ে লড়াই করেছিলেন, অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের শাস্তিদানের জন্য গুপ্তহত্যার পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে সাম্রাজ্যবাদীরা 'সন্ত্রাসবাদী' বলে আখ্যা দিত। কিন্তু দেশবাসী তাঁদের দেশপ্রেমিক বীর বিপ্লবী বলে আজও শ্রদ্ধা করে যাচ্ছে। তেমনি আমরা মনে করি, আজ যাঁরা ইরাকে, প্যালেস্তাইনে, আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে, তাঁরাও দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা।

আবার কাশ্মীরেও এক ধরনের সন্ত্রাসবাদ চলছে, যেটা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু কাশ্মীরে এই সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিতে পারল কি করে? এর জন্য শুধু পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুললেই কি ভারতের শাসকরা তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারবে? এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে, দেশভাগের সময় যখন পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করার জন্য আক্রমণ করেছিল তখন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কাশ্মীরের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের অবিসংবাদী জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ভারতের সাহায্য নিয়েই পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধ করেছিল এবং ভারতের সাথে কাশ্মীরের সংযুক্তি করিয়েছিল। সেদিন এই সংযুক্তির সিদ্ধান্তকে কাশ্মীরের জনগণ সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছিল। এই সংযুক্তির চুক্তির ক্ষেত্রে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শাসকরা এই স্বায়ত্তশাসনের শর্তগুলো লঙ্ঘন করার ফলেই কাশ্মীরে প্রবল জনবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ভারত সরকার এই বিক্ষোভকে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পথে সমাধানের রাস্তায় না গিয়ে মিলিটারি দিয়ে ব্যাপক দমন-নিপীড়নের পথে যাওয়ায় এই বিক্ষোভের আগুন আরও বাড়তে থাকে এবং তারই সুযোগ নেয় পাকিস্তানি শাসকবর্গ। আজ কাশ্মীরে তিন ধরনের রাজনৈতিক শক্তি কাজ করছে — একদল পূর্বতন চুক্তি অনুযায়ী ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যেই থাকতে চাইছে। আরেক দল পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তি চাইছে। আরেক দলের লক্ষ্য ভারত বা পাকিস্তান কারোর সাথেই নয়, স্বতন্ত্র আজাদ কাশ্মীর। আমরা মনে করি, কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ভারত সরকারের ভূমিকার জন্যই এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। আর এখান থেকেই কিছু বিপথগামী যুবক সন্ত্রাসবাদের পথে গেছে, যেমন পাঞ্জাবে এক সময় খালিস্থানীরা মাথাচাড়া দিয়েছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্বভারতে নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে, মিজোরামে, ত্রিপুরা, আসামে যারা সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে তারা কি মুসলিম? অত্যাচারিত উপজাতীয় বিক্ষোভ বিপথগামী হওয়াতেই এইসব জায়গায় সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ, যেটা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সন্ত্রাসবাদীরা রাষ্ট্রের বিপুল সামরিক বাহিনী ও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশেও রাজ্যে রাজ্যে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদই আমরা দেখছি। আবার সম্প্রতি গুজরাটে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে সমগ্র প্রশাসন ও পুলিশকে ব্যবহার করে যে ভয়াবহ গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে সেটাও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। সেইজন্যই বলছিলাম, ঢালাওভাবে সব সন্ত্রাসবাদকে এক ক্যাটিগরিতে ফেলা চলে না। ফলে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ই সন্ত্রাসবাদী — এটা একটা ডাহা মিথ্যা প্রচার এবং যারা এই অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাও জানে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সম্পূর্ণ ভোটের স্বার্থে হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালাবার জন্যই তারা এই মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। আমি উদ্যোক্তাদের বলব — 'টেররিজম অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্', এই সাবজেক্টটা রাখা তাদের ঠিক হয়নি। যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধিমূলক অপপ্রচার চলছে তার জন্যই এই সাবজেক্ট রাখতে হবে, এটা ঠিক নয়। সাবজেক্ট হওয়া উচিত ছিল 'টেররিজম কি, কেন এটা হচ্ছে, এর সমাধান কোথায়'। এবং আজকের এই সভা হওয়া উচিত ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের যৌথ প্রচেষ্টায়।

আমার আগে একজন বিজেপি নেতা যেহেতু কিছু বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখেছেন, তার জন্য বাধ্য হয়েই আমাকে আরো কিছু কথা বলতে হচ্ছে। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের জন্য ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দায়ী করলে চলবে না। এর জন্য তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী আপোষকামী নেতৃত্বও কম দায়ী নন। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল। এই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব একদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে আপোষহীন ধারার প্রতিভূ নেতাজী ও অন্যান্যদের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদকে বিরুদ্ধতা করে ও অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেকুলার হিউম্যানিজমের পরিবর্তে ধর্ম ও জাতপাতের সাথে আপোষ করে ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ নিয়েছিল। এই নেতৃত্ব যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। সেকুলার হিউম্যানিজমের অর্থ হচ্ছে পার্থিব মানবতাবাদ — অর্থাৎ কোন অপার্থিব বা ধর্মীয় চিন্তার থেকে মুক্ত মানবতাবাদ। নেতাজী বলেছিলেন — রাজনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতি চলবে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক নিয়মে। ধর্ম হবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা এটা মানেন নি। তাঁরা হিন্দু ধর্মের উদারতা ও সহনশীলতা প্রচার করে বাস্তবে মূলত হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার করেছিলেন। এবং এটা শুধু হিন্দুধর্মভিত্তিক বললে ভুল হবে, এটা ছিল মূলতঃ উচ্চবর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ, যার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হতে পারেনি। আদিবাসীরাও পারে নি। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের এই নেতৃত্ব তৎকালীন শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলিম জনগণের কাছে হিন্দু নেতৃত্ব হিসেবে থেকে গেছে। মুসলিম মৌলবাদীরাও এটাকে কাজে লাগিয়েছে। ব্রিটিশরাও 'ডিভাইড এণ্ড রুলের' স্বার্থে এটাকে উস্কানি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এটা স্মরণ করা দরকার, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যাঁরা হিন্দু ছিলেন তাঁরা যখন দেশভাগের পক্ষে ভোট দেন, তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্‌ফর খান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

একথাও ঠিক যে, মন্দির-মসজিদ বিতর্কের সূচনা কংগ্রেস আমলেই হয়েছিল এবং বাবরি মসজিদের দরজা খুলে পূজা তখন থেকে শুরু হয়েছিল। আবার একথাও ঠিক, কংগ্রেস ভোটের স্বার্থে যা শুরু করেছিল, বিজেপি একই স্বার্থে আরো ব্যাপক এবং নগ্নভাবে সেই আগুন জ্বালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বাবর যদি মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করে থাকেন, তাহলে চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যাঁদের হিন্দুরা অবতার বলে গণ্য করে, কেন হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে মসজিদ ভাঙ্গার আওয়াজ তোলেন নি? তাঁরা কি কাপুরুষ ছিলেন? এমন কি তাঁরা কেউই এই অভিযোগও করে যাননি। কারণ এই মিথ্যা চিন্তার জন্ম সেদিন হয় নি, হওয়ার কোন কারণও ছিল না। এই মিথ্যা প্রচার সৃষ্টি করা হয়েছে আজকের যুগে স্রেফ নির্বাচনী স্বার্থে — হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য। এই যে বাবরি মসজিদের মত একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধকে ধ্বংস করা হল, গুজরাটে ও অন্যত্র হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হল, শত শত নারীর ইজ্জতহানি করা হল, অসংখ্য শিশু পিতৃমাতৃহীন হল, আজ বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে, যারা এই ধ্বংসকাণ্ড চালাল তাদের বিরুদ্ধে কি অস্ত্রধারণ করতেন না? নিশ্চয়ই করতেন। বিজেপিকে আগামী দিনের ইতিহাসের কাছে এজন্য অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।

আপনারা জানেন, আমাদের দল ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চর্চা করে না। হিন্দু বা মুসলিম কোন ভোটব্যাঙ্কের আমাদের দরকার নেই। আমরা শোষণ-অত্যাচার-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি, গণআন্দোলন গড়ে তুলি। তাই আপনাদের বলব, আপনারা যখন মসজিদে যান তখন আপনারা মুসলিম, হিন্দুরা যখন মন্দিরে যান তখন তারা হিন্দু। কিন্তু সমাজজীবনে আমাদের সকলের একটাই পরিচয়, সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ — শ্রমিক কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুবক, ছোট দোকানদার — এক কথায় গরিব মানুষ। আজ দেশ দু'ভাগে বিভক্ত। কিন্তু সে ভাগ হিন্দু-মুসলিম নয়, সে ভাগ হচ্ছে মালিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোষিত, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। জীবনের যা কিছু সঙ্কট আজ আমাদের জর্জরিত করে তুলছে — অর্থাৎ বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, শিক্ষা সঙ্কট, নানা জুলুম ও অত্যাচার — এসব কোনটাই ধর্মভিত্তিক ঘটছে না। সব ধর্মের সাধারণ মানুষ একই সঙ্কটে জর্জরিত হচ্ছে। তাই চাই সকল ধর্মীয় ও জাতপাতের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আর এই ঐক্য যাতে না গড়ে ওঠে, তার জন্য শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী ও শাসক দলগুলো ব্রিটিশদের মতই সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করছে। আজ মানুষের চোখকে জীবনের মূল সমস্যা থেকে তারা অন্যদিকে সরিয়ে দিচ্ছে। মনে রাখবেন, যত হিন্দু ঐক্য স্লোগান উঠবে ততই যেমন মুসলিম ঐক্যের আওয়াজ বাড়বে, তেমনি মুসলিম ঐক্যের উদ্যোগ হিন্দুত্ববাদীদের হিন্দু ঐক্য গড়ার ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করবে। মনে রাখতে হবে, ধর্ম মানা, আর ধর্মীয় মৌলবাদ মানা এক নয়। মৌলবাদ মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ, পঙ্গু, সঙ্কীর্ণতাবাদী, প্রগতিবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিতে পরিণত করে। ফলে হিন্দু বা মুসলিম

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ১৭ অক্টোবর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ৯ সংখ্যা

১০ অক্টোবর, ২০০৩

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আয়োজিত

নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তাব

কলকাতা মহানগরীতে সভা-সমাবেশ-মিছিল সংগঠিত করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট গত ২৯ সেপ্টেম্বর যে রায় দিয়েছেন, এই নাগরিক কনভেনশন তার তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করছে। এই রায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ (১) ছুটির দিন ছাড়া সভা-সমাবেশ ও মিছিল করা চলবে না এবং (২) ছুটির দিনে পুলিশের অনুমতি সাপেক্ষে ও মোটা অঙ্কের টাকা পুলিশের কাছে আগাম জমা দিয়ে সভা-সমাবেশ বা মিছিল করতে হবে। রায়-এ আরও বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ মিছিল-মিটিং-এর জন্য তার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করে ক্ষতিপূরণ চায়, তাহলে পুলিশ ঐ জমা টাকা থেকে সেই ক্ষতিপূরণ দেবে। বাস্তবিক পক্ষে এর ফলে কার্যত ছুটির দিনেও মিছিল-মিটিং করার উপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। আজকের আহূত এই গণকনভেনশন মনে করে যে, অন্যায় অত্যাচার শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার, সংগঠিত আওয়াজ তোলার, জনগণের সংগঠিত হওয়ার প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কাঠামোর অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত, তাকে কলমের এক খোঁচায় কেড়ে নেওয়া হল। আর এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হল এমন একটা সময়ে যখন এই রাজ্যের জনজীবনের হাল অন্যান্য রাজ্যের মতোই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বহুমুখী আক্রমণে আক্রান্ত এবং যখন আক্রান্ত জনগণের সংগঠিত হওয়ার, প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন সর্বাধিক।

এই কনভেনশন একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারায়, তার এগিয়ে চলার প্রয়োজনে বহু কষ্টসাধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ এমন কিছু মৌলিক অধিকার অর্জন করেছেন যা রাষ্ট্র, সরকার, আইন বা বিচারব্যবস্থার স্বীকৃতি নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে এবং তা কারোর অনুমোদন নির্ভর নয়। সভা-সমাবেশ-মিছিল-প্রতিবাদ করার অধিকার সভ্যতার অঙ্গ রূপেই একটি জনস্বার্থবাহী অধিকার। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ্য যে, ভারতীয় সংবিধানের ১৯নং ধারাতেও এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার আইন কিংবা আদালতের নেই। এমনকি ব্যক্তির অসুবিধা, তার অধিকার-স্বাধীনতার সেন্টিমেন্টাল কথা তুলে সামাজিক প্রয়োজনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না।

আজকের এই মহতী কনভেনশন এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছে যে, আজ বিশ্ব জুড়ে নজিরবিহীন বাজার-মন্দার ধাক্কায় আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছাঁটাই লে-অফের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য দাবিতে ব্যাপক মিছিল, মিটিং, অবরোধ হলেও সেখানে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। আমাদের দেশেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুগে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্ষেত্রবিশেষে যে চেষ্টা হয়েছে তা শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ব্রিটিশ আমলে পাঞ্জাবে মার্শাল আইনে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিরুদ্ধে, জালিয়ানওয়ালাবাগে 'নিষিদ্ধ' সমাবেশের ওপর গুলিচালনা ও রাউলাট আইনে মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ যেভাবে গর্জে উঠেছিল — এই সভা সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করছে।

এই কনভেনশনের দৃঢ় অভিমত হল — কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কেরালা হাইকোর্টের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটে নিষেধাজ্ঞা, ধর্মঘট করার জন্য তামিলনাড়ুর কয়েক হাজার সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে কোন কোন মহলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলের উপর 'প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ'-এর ওকালতি — একটি সুকৌশলী প্রক্রিয়া যার অনিবার্য পরিণতি জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর চূড়ান্ত আঘাত।

সর্বশেষে এই কনভেনশন বন্‌ধ, ধর্মঘট, মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আদালতের রায়কে স্মরণে রেখে বিচারব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জনস্বার্থবিরোধী প্রবণতার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সামগ্রিকভাবে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে।

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

হাইকোর্টের রায় ঃ সিপিএম সরকারই জমি তৈরি করে দিয়েছে

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইণ্ডিয়া (এস ইউ সি আই)'র কেন্দ্রীয় কমিটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে — এই শহরে মিছিল ও সমাবেশ বন্ধ করার এবং কাজের দিনে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে তা নিষিদ্ধ করার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, এই দানবীয় আদেশ বিশ্বে গণতান্ত্রিক শাসনের ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদার শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গুলিহেলনে পরিকল্পিত এই আদেশ শুধুমাত্র সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সামনেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না, একেবারে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করছে। এ আদেশ অবশ্যই ফ্যাসিবাদী চক্রান্তের ইঙ্গিত বহন করছে।

এই ঘটনা আর একবার প্রমাণ করল যে, বিচারব্যবস্থার তথাকথিত নিরপেক্ষতা আকাশকুসুম ছাড়া কিছুই নয়; বাস্তবে এই ব্যবস্থা পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থকেই রক্ষা করে। এটি ঐ শ্রেণী শাসনেরই আরেকটি হাতিয়ার। বিচারব্যবস্থার চরিত্রের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করে যে, পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যেভাবে শাসকশ্রেণীর মন জয় করার এবং তাদের একের পর এক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং 'যুক্তিসঙ্গত' জাতীয় মধুমাখা শব্দ প্রয়োগ করে মিটিং-মিছিলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য বারবার উমেদারি করে এসেছে — তার ফলেই হাইকোর্ট দ্বারা এই ধরনের গণতন্ত্রবিরোধী আদেশ জারি করার রাস্তা তৈরি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চিত যে, এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে এই আদেশকে অগ্রাহ্য করার এবং এই চূড়ান্ত অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এই আদেশকে অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি এস ইউ সি আই দলের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার করার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে সর্বশক্তি দিয়ে সেই আন্দোলনে যোগদান করার জন্য।

ইজরায়েলি বিমানহানা নগ্ন সামরিক আগ্রাসন

সীমান্ত লংঘন করে সিরিয়ার ভূখণ্ডে গত ৫ অক্টোবর ইজরায়েলি বিমান হামলার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, সকল আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রসংঘের সনদকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ইজরায়েলের জিয়নিস্ট সরকার, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণ মদতে সিরিয়ার ভিতরে যে বিমান হানা চালিয়েছে তাকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর নগ্ন সামরিক আগ্রাসনই বলতে হবে।

প্যালেস্তাইন জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়েই যে সিরিয়ার বিরুদ্ধে এই নগ্ন আক্রমণ হানা হয়েছে, সেই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমরেড মুখার্জী বলেন, ইজরায়েলের জিয়নিস্ট সরকারের এই স্পর্ধিত আচরণ প্যালেস্তাইন সমস্যার ন্যায্য ও দ্রুত সমাধানকেই আরও ব্যাহত করবে।

এই জঘন্য আগ্রাসনের তীব্র নিন্দায় বিশ্বের শান্তিকামী জনগণকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যর্থ হলে তার দ্বারা নিশ্চিতভাবেই গোটা বিশ্বের জনগণকে বন্দিদশায় ধরে রাখতে ও এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেরই মদত জোগানো হবে।

ধর্ম সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয় না

সাতের পাতার পর

মৌলবাদ কোনটাই ধর্মবিশ্বাসীদের গ্রহণ করা চলে না।

আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যের প্রশ্নে কোন দেশ, জাত, ধর্মীয় বাধা থাকবে না। একদিকে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ। তেমনি দেশের অভ্যন্তরে একদিকে পুঁজিবাদ, আরেক দিকে পুঁজিবাদবিরোধী জনগণ। এইভাবেই আমাদের বুঝতে হবে।

এখানে বিজেপি নেতা দাবি করে গেলেন, বাজপেয়ী সরকার ইরাকে ভারতীয় সৈন্যদের যে পাঠাচ্ছে না, এটা ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতির জন্যই হচ্ছে। এই দাবি আদৌ ঠিক নয়। বিজেপি সরকার ইরাকে ভারতীয় সৈন্য পাঠাবার কথাই ভাবছিল। এ নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে কিছু কিছু আলোচনা ও দরকষাকষি করছিল। কিন্তু ভারত সরকার আটকে গেছে, যেহেতু ভারতের জনগণ ইরাকে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো কিছুতেই সমর্থন করবে না এবং সামনে পাঁচটি রাজ্যে ইলেক্‌শন দাঁড়িয়ে আছে। ভারত সরকার এখনও বলছে, ইউ এন ও'র নামে যদি সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব আসে তাহলে তারা পাঠাবে। এইজন্য প্রেসিডেন্ট বুশ সম্প্রতি বলেছেন, বাজপেয়ী সরকার যে আগামী ইলেকশনের জন্য ইরাকে সৈন্য পাঠাতে পারছে না, এটা তারা বুঝতে পেরেছে। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী আদবানী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র আওয়াজ তুলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইজরায়েলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' এ কোন্ ধরনের ঐক্যের আহবান? এই তো ভারতের শাসকদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার নমুনা! আর ভারত সরকার এই সুযোগে চাইছে আমেরিকাকে চাপ দিতে, যাতে আমেরিকা পাকিস্তানকে কাশ্মীর থেকে হাত ওঠাতে বাধ্য করে। তাই সম্প্রতি ভারত বলছে, 'ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন, এ অবস্থায় কী করে ইরাকে সৈন্য পাঠাবে'? ফলে এইসব হচ্ছে রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ।

আমি আর বিশেষ কিছু বলব না। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের একজন ছাত্র হিসাবে যা বুঝেছি, তাই আপনাদের কাছে রেখে গেলাম। আশা করি, আপনারা ভেবে দেখবেন। আবারও আপনাদের আবেদন করব, বাঁচার দাবিতে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হোন।

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে

ইরাক থেকে মার্কিন সেনা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

১৫-১৬ নভেম্বর ২০০৩, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল

দেশের ও বিদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net